গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ পটুয়াখালী

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
পটুয়াখালী

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২।
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : পটুয়াখালী

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ, ড. মোঃ লিয়াকত আলী ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে পটুয়াখালী জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি সম্পদ, বনজ ও ফলজ সম্পদ এবং মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বা. প. ব্যু.)- এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে পটুয়াখালীর উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১। আহমেদ, সিরাজউদ্দীন, ১৯৮২। বরিশাল বিভাগের ইতিহাস। ভাস্কর প্রকাশনী, বরিশাল-ঢাকা। ঢাকা, জুলাই, ২০০৩

২। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ২০০২। সংকলন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পটুয়াখালী জেলা শাখা। পটুয়াখালী, নভেম্বর, ২০০২।

৩। বিবিএস, ২০০১। কৃষি শুমারী ১৯৯৬: জেলা সিরিজ পটুয়াখালী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জুলাই, ২০০১।

৪। ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৫। PDO-ICZMP, 2001.Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh, Dhaka, August 2001

৬। CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services, Dhaka, May 2004.

৭। M.A. Latif, Major GeneraL, 1982. Bangladesh District Gajetteers Patuakhali, Establishment, Division, Government of the People's Republic of Bangladesh. Dhaka, December 1982.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে পটুয়াখালী জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব মোঃ বজলুর রহমান, সিনিয়র তথ্য অফিসার, পটুয়াখালী।
- জনাব মির্জা এস আই খালেদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সংকল্প ট্রাষ্ট, পাথরঘাটা, বরগুনা।
- জনাব র. ম. আওরঙ্গজেব, সহকারী মিডিয়া সেন্টার প্রধান, এমএমসি, পটুয়াখালী।
- জনাব কালাচাঁদ শীল, সহকারী অধ্যাপক, পটুয়াখালী সরকারী মহিলা কলেজ, পটুয়াখালী।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৪**
এক নজরে পটুয়াখালী ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৭-১৩**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৭
কৃষি সম্পদ ১০
মৎস্য সম্পদ ১১
দুর্যোগ ১২
বিপদাপন্নতা ১৩

জীবন ও জীবিকা **১৫-১৮**
জনসংখ্যা ১৫
জনস্বাস্থ্য ১৫
শিক্ষা ১৬
সামাজিক উন্নয়ন ১৬
প্রধান জীবিকা দল ১৬
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৭

নারীদের অবস্থান **১৯-২০**

অবকাঠামো **২১-২৩**
ভৌত অবকাঠামো ২১
শিল্প ২২
উন্নয়ন প্রকল্প ২২

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২৫-২৭**
পরিবেশগত সমস্যা ২৫
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৬
কৃষি বিষয়ক সমস্যা ২৬
পর্যটন বিষয়ক সমস্যা ২৬

সম্ভাবনা ও সুযোগ **২৯-৩০**
কৃষি ও অর্থনীতি ২৯
পর্যটন শিল্প ৩০
শিল্প ও বাণিজ্য ৩০
প্রাকৃতিক সম্পদ ৩০
গণমাধ্যমের উন্নয়ন ৩০

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৩১**

দর্শনীয় স্থান **৩৩**

জেলা মানচিত্র

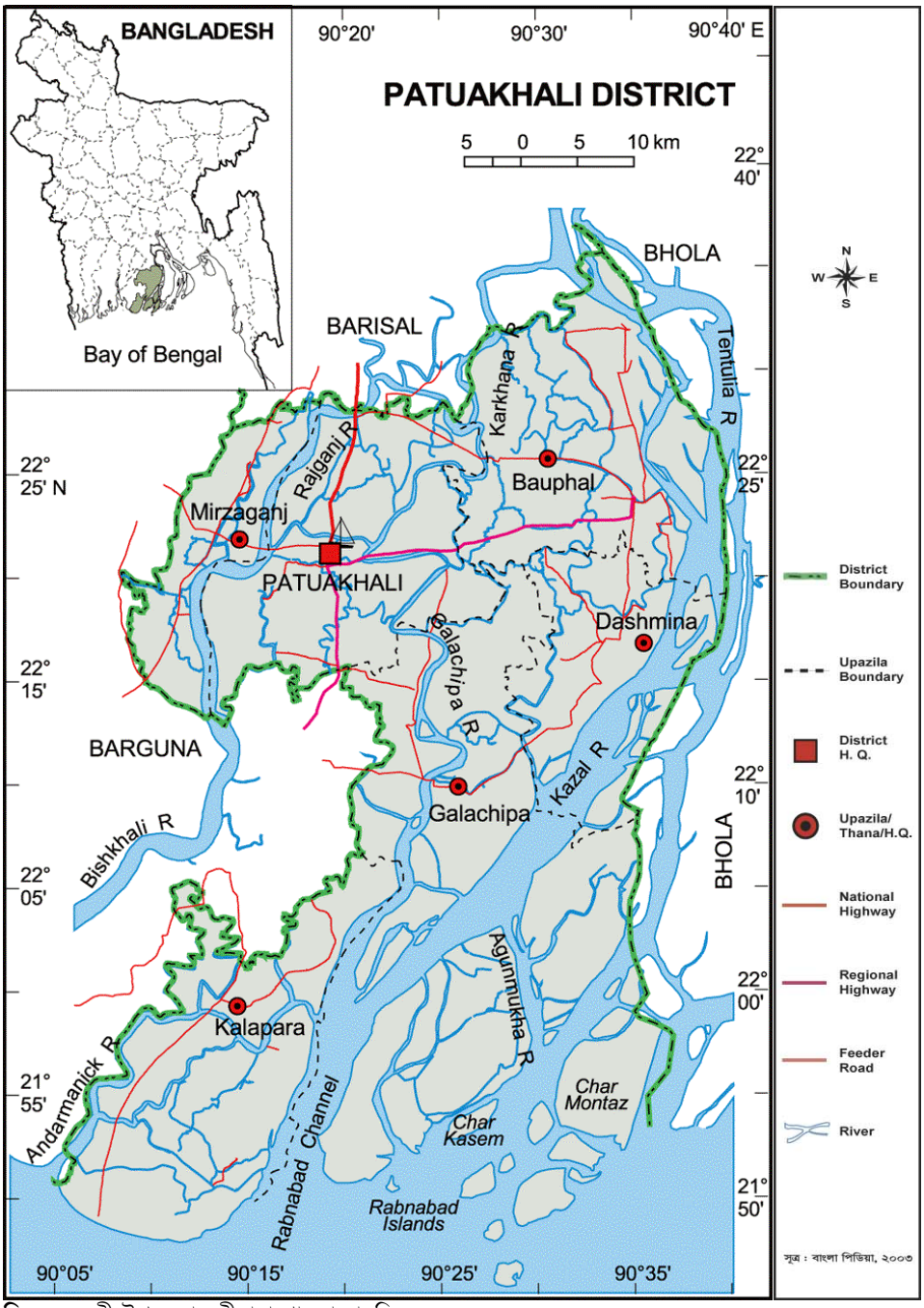

বি.দ্র : দুমকী উপজেলার সীমানা পাওয়া যায়নি।

সূচনা

বিস্তীর্ণ সবুজ ফসলের মাঠ, গাছ-গাছালি, অসংখ্য নদী-নালা এবং সমুদ্র সৈকত নিয়ে এক অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত জেলা পটুয়াখালী। এর উত্তরে ঝালকাঠী, পূর্বে ভোলা, পশ্চিমে বরগুনা জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের দুটি প্রধান নদী পদ্মা-মেঘনার বেশ কয়েকটি শাখা নদী এই জেলার উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলেছে।

১৯৬৯ সালে বর্তমান পটুয়াখালী জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত এই জেলা ছিল বরিশাল জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। ১৮৫৫ সালে এই জেলার বাউফল চৌকির মুনসেফ ছিলেন ব্রজমোহন দত্ত। ১৮৬০ সালে ব্রজমোহন দত্ত পটুয়াখালীতে মহকুমা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৮৬৭ সালের ২৭ মার্চ কলকাতা গেজেটে পটুয়াখালী মহকুমা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ সালের জুলাই মাসে পটুয়াখালী মহকুমার কাজ শুরু হয়। মহকুমার সদর দপ্তর প্রথমে ছিল লাউকাঠীতে এবং পরে পটুয়াখালীতে স্থানান্তরিত হয়। উল্লেখ্য, ব্রজমোহন দত্তই পটুয়াখালী মহকুমার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনশ্রুতি অনুসারে, ১৭ শতকে পর্তুগীজ জলদস্যুরা বাকলা চন্দ্রদ্বীপে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা চালায়। জলদস্যুরা সুগন্ধা এবং পায়রা নদীর (ভারনী) সংযোগ খালকে (যা নটুয়ার খাল নামে পরিচিত ছিল) দ্রুত চলাচলের জন্য ব্যবহার করে। ধারনা করা হয় এই খালের নাম থেকেই এলাকার নাম হয় নটুয়াখালী, যা কালের ধারায় এবং ভাষার বিবর্তনে পটুয়াখালী হয়েছে।

উপজেলা	**৭**
পৌরসভা	**৩**
ইউনিয়ন	**৬৭**
ওয়ার্ড	**২৭**
মৌজা / মহল্লা	৬৫০
গ্রাম	**৮৮২**

পটুয়াখালী জেলার আয়তন ৩,২২১ বর্গ কিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট আয়তনের ২.১৮%। আয়তনের দিক দিয়ে জেলার অবস্থান উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে ৭ম, বরিশাল বিভাগীয় ৬টি জেলার মধ্যে ২য় এবং বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৫তম। ৭টি উপজেলা, ৩টি পৌরসভা, ৬৭টি ইউনিয়ন, ২৭টি ওয়ার্ড, ৬৫০টি মৌজা / মহল্লা, ৮৮২টি গ্রাম নিয়ে পটুয়াখালী জেলা। পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দুমকী, দশমিনা, গলাচিপা, কলাপাড়া আর মির্জাগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে পটুয়াখালী জেলার দশমিনা, গলাচিপা, ও কলাপাড়া তীরবর্তী (Exposed Coast) এবং বাউফল, মির্জাগঞ্জ ও পটুয়াখালী সদর উপজেলা অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকায় পড়েছে।

এক নজরে পটুয়াখালী

	বিষয়	একক	পটুয়াখালী	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩২২১	৪৭,২০১	১৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৭	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৬৭	১৩৫১	৪৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	২৭	৭৪৩	২৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৬৫০	১৪৬৩৬	৬৭০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৮৮২	১৭৬১৮	৮৭৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৪.৬৪	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৭.৪২	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৭.২২	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৪৫৫	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৩	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫.২০	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.৮	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১.৮৭	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৭	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪০	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	১৪	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	১১	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৭১	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	১১৪	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	২৭৩১	৬৭৮.৮০০	২,৩৭০,৭৪০	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৮১৩৭	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৯৩৭	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৭	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩১	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১৭	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.১১	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৪৬	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	১৪	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৯	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৫২	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫৫	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৮	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার (১৫ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৪	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬০	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৯	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	১৩৩	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৯২	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৩.২	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/শয্যা	৪৭১৭	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫৬	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯৭	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৭	৬	৫	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৪	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	১০	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৪৫	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- সাক্ষরতার হার ৫২%, যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫১%) তুলনায় বেশি।
- দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টিমানের ভিত্তিতে জেলায় দারিদ্র্যপীড়িত ও অতি দরিদ্র্য গৃহস্থালির সংখ্যা (৪৬%, ১৪%) জাতীয় (৪৯%, ২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫২%, ২৪%) তুলনায় কম।
- জেলার মোট গৃহের ৯২% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৮৮%) তুলনায় বেশি।
- নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- পটুয়াখালী জেলায় মাথাপিছু আয় (১৮,১৩৭ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৫.৩%) জাতীয় হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) তুলনায় কম।
- জেলায় গড়ে প্রতি ১১৪ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় অপ্রতুল ।
- জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা (৫৬.৩%) জাতীয় (৫২.৬%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৩.৫%) তুলনায় বেশি।
- জেলায় ২৩% ঘড় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাসম্পন্ন, যা জাতীয় (৩৭) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪৬%) তুলনায় কম।
- রাস্তার ঘনত্ব (০.৭১ কি.মি. /বর্গ কি.মি.) জাতীয় (০.৭৬ কি.মি. /বর্গ কি.মি.) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (০.৭২ কি.মি. /বর্গ কি.মি.) তুলনায় কম।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১২%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় ১৪% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা (৫৪.৫%) জাতীয় হারের (৫৩%) তুলনায় বেশি তবে উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় কম।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (৫৬%) জাতীয় হারের (৪৩%) তুলনায় বেশি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় (৫০.৬-৬৮%) কাছাকাছি।
- হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ৪,৭১৭ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৫) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৪,৬৩৭) তুলনায় বেশি।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা (৮%) জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার মোট আয়তনের ৩৯% প্রত্যন্ত এলাকা।

উপজেলা তথ্য সারণী

	বিষয়	একক	পটুয়াখালী	উপজেলা			
				সদর	বাউফল	দশমিনা	দুমকী
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩২২১	৩৬৩	৪৮৭	৩৫২	৯২
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১০৪	২১	১৪	৬	৪
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৬৫০	১৩০	১৩৪	৫৬	২৩
	গ্রাম	সংখ্যা	৮৮২	১২৪	৪৫	৫২	২৪
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৪.৬৪	৩.২	৩.০	১.১	.৭৩
	পুরুষ	লাখ	৭.৪২	১.৬	১.৫	.৫৮	.৪১
	নারী	লাখ	৭.২২	১.৫	১.৫	.৫৯	.৩১
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৪৫৫	৮৯২	৬২৮	৩৩৬	৭৯০
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৩	১০৩	৯৮	৯৭	১৩১
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.৮	.৬১	.৫৯	.২২	.১২
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৫.২০	৫.২২	৫.১৮	৫.১৬	৫.৭৬
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	১.৮৭	১.৯	২.২	২.৫	তথ্য নাই
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়াল সম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৭	৪৬	৪৭	২৭	তথ্য নাই
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪০	৫১	৫৫	৩২	তথ্য নাই
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩	৭.৬৭	৩.৪৩	১.২৬	তথ্য নাই
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৫৯৪	৩৬৪	৩২৭	১৪৯	তথ্য নাই
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২৭২	৭৮	৫৮	২৫	তথ্য নাই
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৩৪	৮	১১	১	তথ্য নাই
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থের (%)	৩১	২৩	২২	৩৮	তথ্য নাই
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	২৬	৭৭	৭২	৭৪	তথ্য নাই
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৭৪	২৩	২৮	২৬	তথ্য নাই
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১৪৮১৮৬	২৪১৬৫	২৮৩৪৪	১৩২১৫	তথ্য নাই
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৫৯	৫৪	২০	৭৪	তথ্য নাই
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৩৭	৪১	৫৭	২০	তথ্য নাই
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৪	৫	২৪	৬	তথ্য নাই
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৫৬০০	৪০০০	৯৫০০	১০০০০	তথ্য নাই
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	মোট জনসংখ্যা (%)	৫২	৫৩	৫১	৩৮	৬৭
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৯	৯৮	১০২	৯৭	তথ্য নাই
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৯	৯৮	১০৩	৯৮	তথ্য নাই
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১১০০৭	২৪৯৫	২৬৯৬	৯৮২	তথ্য নাই
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৭৬	৭৫	৬৪	৬৮	তথ্য নাই
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	২.৬	৫.১৭	২.০৮	.৯৭	তথ্য নাই

উপজেলা			তথ্য সূত্র ও বছর
গলাচিপা	কলাপাড়া	মির্জাগঞ্জ	
১২৬৮	৪৮৩	১৭৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২৫	১৮	৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৫৬	৮৩	৬৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২২৮	২৩৬	৭৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৩.২	২.০	১.১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৬	১.০	.৫৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৫	.৯৯	.৫৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২৫৭	৪১৮	৬৬৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০৬	১০৩	৯৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
.৬১	.৩৯	.২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৫.৩৩	৫.১২	৪.৯০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৬	২.০	২.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২২	১৮	৬০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
২১	১৪	৬০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
২.০০	৩.০৬	৩.০২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৩৪৭	২১১	১৯৬	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
৫২	৩০	২৯	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৯	৩	২	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৩৪	৪০	১৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭৩	৬৯	৮৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২৭	৩১	১৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৪৫২৬৪	২৬৯৮০	১০২১৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৪৫	৮৬	৩২	২০০৩(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৪৮	১১	৪৯	২০০৩(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৭	৩	১৯	২০০৩(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৩০০০	২০০০	৫০০০	২০০৩(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
৪২	৬০	৬০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৯৮	৯৮	১০২	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
৯৯	৯৬	৯৯	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
২২৫৬	১৩৯৪	১১৮৪	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
৮৬	৮৭	৭০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
০.৮৫	৩.৫২	১.৩৫	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস নিয়ে পটুয়াখালী জেলার নিজস্ব বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এই জেলার মোহনায় ও নদীতে রয়েছে ছোট ছোট চর দ্বীপ। জেলার দক্ষিণে লবণ পানি আর উত্তরে মিঠা পানির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে জেলার প্রকৃতি। প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটার কারণে ভূমির উর্বরতা অনেক বেশি। আর তাই জেলার সর্বত্রই সবুজের সমারোহ, মনে হয় যেন উপর থেকে ছেটে দেয়া কোন ঘন অরণ্য।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

নদী ও খাল : পটুয়াখালীর প্রকৃতি নদী আর সাগরনির্ভর। এই জেলার বুক চিরে বয়ে গেছে বেশ কয়েকটি বড় নদী। এ ছাড়াও জালের মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বহু ছোট নদী-নালা আর খাল। মুলত: পদ্মা, মেঘনা আর পদ্মার শাখা আড়িয়ালখাঁ- এই তিন নদীর অববাহিকায় পটুয়াখালী জেলা। এই জেলায় মোট ৬৬৩.৫৩ কি.মি. নদী রয়েছে যা জেলার মোট আয়তনের ২০.৭১% । জেলার সব নদীই নাব্য এবং সারা বছর ধরে নৌযান চলাচলের উপযোগী।

পটুয়াখালী জেলার প্রধান নদীগুলো হচ্ছে, তেতুলিয়া, লোহালিয়া, আন্ধারমানিক, পায়রা, আগুনমুখা, রাবনাবাদ চ্যানেল, পটুয়াখালী কাজল ও বুড়িশ্বর নদী। এ ছাড়াও নাম না জানা বহু নদী আছে। এই নদীগুলো আবার অসংখ্য নালা, ভারনী ও খালে বিভক্ত হয়ে সমগ্র জেলা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কয়েকটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন ধানখালী, নীলগঞ্জ, পটুয়াখালী, গলাচিপা, চরকামাল, কালাইয়া, বীলহীলাসর, রাজগঞ্জ, চানখালী, শ্রীমন্ত, সুবিদখালী ও বুড়া গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।

প্রধান নদী	**তেতুলিয়া, লোহালিয়া, আন্ধারমানিক, পায়রা, আগুনমুখা, রাবনাবাদ চ্যানেল, পটুয়াখালী কাজল ও বুড়িশ্বর**
নদীর দৈর্ঘ্য	**৬৬৩.৫৩ কি.মি.**
উল্লেখযোগ্য নালা, ভারনী ও খাল	**ধানখালী, নীলগঞ্জ, পটুয়াখালী, গলাচিপা, চরকামাল, কালাইয়া, বীলহীলাসর, রাজগঞ্জ, চানখালী, শ্রীমন্ত, সুবিদখালী ও বুড়া গৌরাঙ্গ**

মোহনা : অপরূপ প্রাকৃতিক ও প্রাণের বৈচিত্র্যে ভরা মোহনা মানুষকে কাছে টানে। জেলায় তিনটি নদীর মোহনা রয়েছে, রাব্নাবাদ, বুড়া গৌরাঙ্গ এবং রাঙ্গাবালী।

সৈকত : পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর। এই সাগর তীরে জেলার মূল ভূমি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ সৈকত কুয়াকাটা, যার আয়তন প্রায় ২০ কি.মি.। প্রকৃতির সবুজ বিলাসভূমি এই কুয়াকাটা পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এখানে একইসাথে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায়। এ ছাড়াও এই জেলার সোনাচরেও রয়েছে বিস্তীর্ণ সৈকত। সৈকত এলাকায় বাঁধের ভেতরে ফসলের চাষ হয়।

চর-দ্বীপ : নদী-সাগরের মোহনায় রয়েছে বেশকিছু চর এবং দ্বীপ, যার আয়তন জেলার মোট আয়তনের ৩৯%। তেতুলিয়া নদীর মোহনা এবং তীরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চর হল চরমনতাজ, চরকাসেম, রাঙ্গাবালী, সোনারচর, চরবিশ্বাস, বাইশদিয়াচর, চরকাজল, শিবারচর, চরকচুয়া ও খাশেরচর ইত্যাদি। কিছু কিছু চরে স্থায়ী জনবসতি গড়ে উঠেছে। আবার কিছু কিছু চরে অস্থায়ী বসতি রয়েছে। বন্যায়, বর্ষা মৌসুমে জোয়ার-ভাটার উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার

ফলে এসব চরে বসবাস করা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, কিছু কিছু চরে ফসল, সম্পদ ও জনবসতি রক্ষার জন্য বাঁধ রয়েছে। এইসব চরে জনবসতি বেশি এবং ফসলেরও চাষ হয়। আবার কোন কোন চরে ভরা জোয়ার বা অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ারের পানি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেই। এইসব চরে ফসল উৎপাদনের বিষয়টি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। চর এলাকার মানুষরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে যেমন মিতালী করে বসবাস করছে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছে। রাবনাবাদ জেলার একমাত্র দ্বীপ।

পুকুর-জলাশয় : এই জেলায় ৭,৭০২ হেক্টর পুকুর আছে। এর মধ্যে ৫,১৮১ হেক্টর পুকুরে মাছ চাষ হয়। চাষাবাদযোগ্য পুকুর আছে ১,৫৪১ হেক্টর এবং পতিত আছে ৯৮০ হেক্টর।

মোট পুকুরের পরিমাণ	৭,৭০২ হে.
মাছ চাষের পুকুর	৫,১৮১ হে.
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	১,৫৪১ হে.
পরিত্যক্ত পুকুর	৯৮০ হে.

জলবায়ু : পটুয়াখালী জেলা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে তিনটি মৌসুম জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এই সময়কে অনেকটা প্রাক-বর্ষাকাল বলে ধরা হয়। এ সময় বাতাসে জ্বলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে এবং বেশ গরম অনুভূত হয়। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যা কালবৈশাখী নামে পরিচিত। জুন হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। বছরের প্রায় ৯০% বর্ষণ এ সময় হয়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল।

প্রধানত জুন-জুলাই ও অক্টোবর-নভেম্বরে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রকোপ বেশি হয়। ফলে সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। নভেম্বর-ডিসেম্বরে এবং এপ্রিল-মে মাসের জলোচ্ছ্বাস বা সাইক্লোনে রবিশস্য ও আমন ধানের প্রচুর ক্ষতি হয়।

মাটি : জেলার ভূ-প্রকৃতি সমতল ধরনের। আর মাটি প্রধানত পলিময় এঁটেল ধরনের। জেলার কিছু এলাকায় দো-আঁশ মাটির আধিক্য রয়েছে। এই জেলাকে প্রধানত দুটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, যেমন, ক) গংগা কটাল পলল ভূমি এবং (খ) মেঘনা পলল ভূমি।

ক) গংগা কটাল পলল ভূমি : জেলার উত্তর-পশ্চিম এলাকা এ ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এলাকাটি অপেক্ষাকৃত পুরানো সমতল ডাংগা এবং প্রশস্ত বিল ভূমি দ্বারা গঠিত এবং ছোট বড় খাল দ্বারা বিভক্ত। এ এলাকা সাধারণত বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে স্বল্প গভীরভাবে প্লাবিত হয়।

খ) মেঘনা পলল ভূমি : জেলার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ এ ভূ-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে দক্ষিণে চর এবং দ্বীপের ভূ-প্রকৃতি লবণাক্ত মেঘনা সমুদ্র পলল ভূমি দ্বারা গঠিত। জেলার এই এলাকায় বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে স্বল্প গভীরভাবে প্লাবিত হয় এবং কিছু এলাকা মাঝারি গভীরভাবে প্লাবিত হয়।

বনজ সম্পদ : জেলার বনভূমির পরিমাণ ১৬,৬৮২ হেক্টর। এখানে কোন প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনভূমি নেই। উল্লেখ্য পটুয়াখালী জেলা এক সময় সুন্দরবনের অংশ ছিল। মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বন কেটে তৈরি করা হয়েছে ফসলি জমি ও বসত ভূমি।

চর বনায়ন : জেলার বেশকিছু চরে বনায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কুয়াকাটা, চরমমতাজ, বাইশদিয়া, আণ্ডারচর, চরকাশেম, চররুস্তম ও খাশেরচরের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বাঁধের বাইরের সবুজ বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় কেওরা, গেওয়া, গোলপাতা, বাবলা ও দেশীয় বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগান শুরু হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস থেকে সম্পদ রক্ষায় এইসব গাছের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমুদ্র উপকূলীয় বন : জলোচ্ছ্বাস এবং সাইক্লোন থেকে রেহাই পাবার জন্য ৬০ দশকে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ এর কাজ শুরু হয়। এই বাঁধের বাইরের ভূমিতে বনায়ন করার জন্য ১৯৬৬ সালে তৎকালীন সরকারের বন বিভাগ একটি উদ্যোগ নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলায় ৩২০ হেক্টর ভূমি বনায়ন করা হয়। এর পরে বন বিভাগ ১৯৭৬ সালে উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় বেশকিছু দ্বীপ চর, মূলভূমি সংলগ্ন চর এবং উপকূলীয় বাঁধ বনায়ন করে। এর আওতায় বর্তমানে ১৬,৬৯৩ হেক্টর ভূমি রয়েছে। এ ছাড়াও সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকেও বাঁধ ও রাস্তায় বনায়ন করা হয়েছে।

উদ্ভিদ-জীব বৈচিত্র্য : পটুয়াখালী জেলার নদীতে জোয়ার-ভাটা হয়, ফলে অতি সহজেই গাছ-গাছালি জন্মে এবং দ্রুত বড় হয়। জেলার উত্তর অংশ লবণবিহীন পলি এবং দক্ষিণ অংশ লবণযুক্ত পলি দ্বারা গঠিত। তাই স্বাভাবিক কারণে জেলার ভূ প্রকৃতি উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্যে প্রভাব রাখে।

পটুয়াখালী জেলার সর্বত্র বিভিন্ন রকমের দেশীয় সবুজ গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা। এই জেলায় প্রচুর প্রচুর বনজ ও ফলজ গাছ রয়েছে। প্রধান গাছ বলতে যেমন আম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, আতাফল, শরিফা, কামরাঙ্গা, পাতরাজ, সুপারি, নিম, কড়ই, টল্লাবন, হিজল, অরিআম, শিমুল, বিলাতিগাব, পলাশ, পেঁপে, সোনালু, জামবুরা, মান্দার, বট, অশ্বথ, ডুমুর, জারুল, দেশী গাব, সাজনা, খেজুর, দেবদারু, পেয়ারা, রেইনট্রি, জাত কড়াই ইত্যাদি প্রধান। এ ছাড়াও রয়েছে চালতা, পাইনাল, কাউ, করমচা, ছৈইলা, আমড়া, জলপাই, পলাশ ও কেওরাকান্ত ইত্যাদি গাছ। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই ঝোপঝাড়, বাঁশঝাড়, কলা বাগান, নারিকেল-সুপারি গাছ রয়েছে।

উল্লেখ্য পটুয়াখালী জেলায় এখনও কিছু কিছু সুন্দরবনের গাছ দেখা যায়। যেমন গাব, হরিতকী, কেওড়া, বয়রা ও রয়না। এ ছাড়াও নদীর পাড়ে হোগলা, গোলপাতা ও হেতাল গাছ দেখা যায়, যা ঘরের চাল তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় তৃণ লতাপাতার মধ্যে দেখা যায় হাবজাযা, নোলা জাও, টামবুল কাটা, ছোদাবান, সুন্দরী লতা, শিংগারা, কালশি ইত্যাদি।

জেলার বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন জাতের কুমির, হাঙ্গর, খরগোস, ডোরাবাঘ, বন্য শূকর, চিত্রা হরিণ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বানর, মেছো বিড়াল, বাগদাস, খাটাস, গন্ধগোকুল, ছোট বেজী, সাধারণ বড় বেজী, পাতিশিয়াল, উদ বিড়াল, কলাবাদুড়, মধ্যম আকারের বাদুড়, ভুয়া রক্তচোষা বাদুড়, চামচিকা, ব্রাশজেলা সজারু, চূড়াহীন হিমালয়ী সজারু, বাটা, কালো ইঁদুর, বাইট্যা বা নেংটি ইঁদুর, ব্যান্ডিকোটা ইঁদুর, ছোট ব্যান্ডিকোটা ইঁদুর, চিকা, পদ্মা শুশুক বা হু ইত্যাদি জেলার প্রধান কয়টি প্রাণী।

এ ছাড়াও সরিসৃপের মধ্যে রয়েছে সুন্দি কাছিম, কাউটা কাছিম, মগম কাছিম ও দুরা, টিকটিকি, রক্তচোষা, তক্ষক বা তক্ষণাথ, আর্জিনা, গুঁইসাপ, দেয়াল টিকটিকি, অজগর, একচক্র জাতিসাপ, দ্বিচক্র জাতিসাপ, শঙ্খিনী, দুমুখো সাপ, কেউটে, ঢোঁড়া সাপ, মাইটে সাপ, দাড়াস বা ধামন সাপ, লাউডগা, ৫-৬ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ মোহনার লাটি সাপ, চন্দ্র বোড়া, সরু কানা সাপ, বামন কানা সাপ ইত্যাদি।

এই জেলায় বহু পাখ-পাখালি দেখা যায়। প্রধান ডুবুরি, ছোট পাখিদের মধ্যে পানকৌড়ি বা ছোট পানিকামড়ি, গয়ার বা সাপ পাকি, কর্চি বক বা গুজা বক, মহিষে বক বা গো বক, ডাড় বক বা ধলি বক, মাঝারি বক, ছোট বক, নিশাবক বা অক, রঙ্গিলা বা সোন ডঙ্গা, ঘোঙটা বা বাচি চোরা, বুনো রাজহাঁস, ছোট সরাল বা মরাল, বড় সরাল বা মরাল, বামন হাঁস, বালিহাঁস, চখাচখি, ভুবন চিল, শঙ্খচিল বা লাল চিল, কোরা ঈগল, ডাহুক, কোরা, কালো কুট,

জলপিপি, লাল হোট টিটি, হলুদ হোটাটিটি, জল চা পাখি, সুচ লেজা চ্যাগা, বাটান, রঙিগলা চ্যাগা, পদ্মা জল কবুতর, কালো মাথা জল কবুতর, মাছ খেকো গাঙচিল, কালচে গাঙচিল, কপোত বা বুনো কবুতর, সবুজ কবুতর বা হরিয়াল, সবুজ ঘুঘু, লাল ঘুঘু, রাজ ঘুঘু বা ধোরাল ঘুঘু, টিলা ঘুঘু, চোখ গেলো, বউ কথা কও, পাপিয়া, কালো কোকিল, কানা কোয়া, লক্ষী পেঁচা, কাঠুরে পেঁচা, যুক্ত পেঁচা, রাত চরা পাখি, নাককাঠি, আবাবিল, পাকরা মাছরাঙা, সবুজ সুই চোর, নীল কণ্ঠ, হুদ হুদ, বসন্ত বাউরী বা কপার স্মিথ, বড় ভগীরথ, নীলগলা ভগীরথ, মেঠো কুড়ালী বা কাঠ ঠোকরা, সবুজ কুড়ালী, ক্ষুদে সোনলী কুড়ালী, বড় সোনালী কুড়ালী, পূবে আকাশি ভরত, সাধারণ সোয়ালো, বাঘাটিকি, বাদামী কসাই পাখি, কালোমাথা হলদে পাখি, হলুদিয়া পাখি বা বেনে বউ, কালো ফিঙ্গে, গুবরে শালিক, কাঠ শালিক, ভাত শালিক, ঝুট শালিক, তাড়ুয়া বা হাঁড়ি চাচা, পাতিকাক, দাঁড়কাক, ক্ষুদে সাত সেলি, ফটিকজল, সিপাহী বুলবুল, বুলবুল, লাল বুক চোটক, সাদা ভুরু বরন বাটা, টুনটুনি, দোয়েল, সাতেরি, সাত ভাইলা, ধূসর টিট, বাদামী উড নাটাক, গেছো পিপিট, সাদা খঞ্জনা, হলুদ মাথা খঞ্জনা, ফুলচুষি, বেগুনি মৌচুষি, বেগুনি পুচ্ছ ভিত্তি মৌচুষি, ছিটা মুনিয়া, লাল মুনিয়া, বাবুই বা বয়নকারী পাখি, চড়ুই এর নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : পটুয়াখালী জেলা কৃষি নির্ভর। জেলার বৃহৎ অংশে কৃষি কাজ করা হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফসলের মাঠ আর গ্রামগুলো গাঢ় সবুজে ভরা থাকে। আবার অগ্রহায়নের শুরু থেকেই সোনালী ধানের অপূর্ব দৃশ্যে প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয় পটুয়াখালী জেলা। জেলার মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৪৮১৮৬ হেক্টর।

প্রধান অর্থকরী ফসল	**নারিকেল, সুপারি, পান, কলা, আখ**
প্রধান ফসল	**ধান, ডাল, বাদাম, সরিষা, সুপারি, গম, আলু এবং আখ**

প্রধান ফসল : জেলার প্রধান ফসল ধান। তাই বেশিরভাগ জমিতে রোপা আমন ধান চাষ হয়। এ ছাড়া আউশ ও বোরো ধানের চাষ করা হয়। অন্যান্য শস্যের মধ্যে ডাল, বাদাম, সরিষা, সয়াবিন, তিল, সূর্যমুখী, খেসারি, ছোলা, ফেলন, মুশুরি, মটর, মুগ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। শীতকালীন শাক-সবজির মধ্যে আলু, ওলকচু, মূলা, শালগম, মিষ্টি আলু, কুমড়া, লাউ, শিম, বরবটি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, ঝিঙ্গা, চালকুমড়া, চিচিংগা, লালশাক, ডাঁটাশাক, ঢেঁড়শ, শশা, পটল, পালংশাক, ধনিয়াশাক, পুঁইশাক, কচুলতি শাক, কচু, বেগুন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

নারিকেল, সুপারি, পান, কলা, আখ ইত্যাদি জেলার অর্থকরী ফসল। জেলার উত্তরাংশে অর্থাৎ মিঠা পানি এলাকায় প্রচুর কলা বাগান রয়েছে। এ ছাড়া বসতবাড়ির আশপাশে প্রচুর দেশীয় কলা যেমন কাঠালী কলা, দুধ কাঠালী ও সাগর কলা গাছ দেখা যায়।

মোট গবাদিপশু র সংখ্যা	**৩৮২৪৪৩টি**
ঘর প্রতি গবাদিপশু (গড়)	**৩.২৪টি**

পশু সম্পদ : কৃষি শুমারি ১৯৯৬ অনুসারে লক্ষীপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ১১৭৯৩৬টি গৃহে গবাদিপশু রয়েছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৪৮% এবং গৃহস্থালিগুলোর মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৩৮২৪৪৩। অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে গড়ে ৩.২৪টি করে গবাদিপশু আছে। জেলার বেশিরভাগ গৃহস্থই হাঁস মুরগি, গরু, ছাগল লালন-পালন করে। এই জেলায় মহিষ পালনের প্রবণতা রয়েছে এবং চাষাবাদের জন্য মহিষের ব্যবহার উল্লেখ করার মত।

মৎস্য সম্পদ

সাগরের মাছ : জেলার সমুদ্র উপকূল এবং মোহনায় প্রচুর সাগরের মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রূপচান্দা, বাটা, ফাইসা, গুইচ্ছা, ভেটকি, পীতাম্বরী, হাউজীপাতা বা শাপলাপাতা, পাখি মাছ, বাদুড় মাছ, বিদ্যুৎ মাছ, গুর্তা, চন্দনা ও পদ্মা ইলিশ, সাগর মাগুর, উড়াল মাছ, বংশী মাছ, তুলার ডাটি, ফ্যাসার প্রজাতি, কোড়াল মাছ, কাটা মৌছি, সাগর কাউন, লোটিয়া, চান্দা, দাতিনা, সাদা পোয়া, ছুরি মাছ, তাউল্লা বা তাউড়া, সোলি মাছ, রূপালী পটকা, বাদামী পটকা, বিষতারা, ফিতা মাচ, ডোরা রঙ্গিলা, গুটি মুর বাইল্লা, খল্লা, কাউয়া, সাগর চাপিলা ইত্যাদি। এ রকম প্রায় ১৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ এ উপকূলে পাওয়া যায়।

জেলার কলাপাড়া সমুদ্র উপকূলে প্রচুর চিংড়ির পোনা ধরা হয়। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির অপ্রচলিত সম্পদ যেমন শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, শৈবাল, সী উইড, জেলী মাছ, কচ্ছপ ও প্রবাল।

মিঠা পানির মাছ : জেলার নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও পুকুরে প্রচুর মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায়। প্রধান কয়টি মিঠা পানির মাছ হল চাপিলা, কাচকি, ফ্যাসা, চিতল, ফলি, রুই, কাতলা, ঘনিয়া, কালিবাউশ, নানদিনা, মৃগেল, রায়েক, কমনকার্প, ঘেসো রুই, সরপুঁটি, থাইসরপুঁটি, চোলাপুঁটি, তিতপুঁটি, ফুটনীপুঁটি, দেতোপুটি, কোসাপুঁটি, কাঞ্চনপুঁটি, মলা, নারকেলি চেলা, ছ্যাপচেলা, বাশঁপাতা, গুজি আইর, তল্লা আইর, গুলশা টেংরা, গুলো টেংরা, বুজুরী টেংরা, কাউনে, রিটা, রোল, পাবদা, গাউড়া, কাজলি, বাচা, সিলেন্দা, পাঙ্গাস, বাঘা আইর, গজার, শোল, টাকি, তেলোটাকি, কুঁচে, টাকা চান্দা, ভেদা, নাপতে কতই, তেলাপিয়া মোজাম্বিকা, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা, তুণ্ডবেলে, ডোরা বেলে, দুধু বেলে, কালতু বেলে, পোয়া, লাল চেউ, ডরকী চেউ, মাডস্কীপার বা ডঙ্কুর, কই, খলিসা, বইচা, খল্লা, কেচি খল্ল, তপসে, বড় বাইন, গুটি বাইন, তার বাইন, টেপা, পটকা ইত্যাদি। জেলার পুকুর-জলাশয় ১৬,৩১৪ মে. টন মাছ উৎপাদিত হয় (মৎস্য বিভাগ ২০০৩)। পুকুরে সাধারণত রুই, কাতল, মৃগেল, গ্রাসকাপ, কালিবাউশ, সিলভারকাপ ও তেলাপিয়া মাছ চাষ করা হয় ইত্যাদি।

চিংড়ি : পটুয়াখালী জেলার ১৯৯৬-৯৭ সালে ২৪৬ হেক্টর চিংড়ি চাষের জমি থেকে ৩৮ মে. টন এবং ২০০১-০২ সালে সমপরিমান জমি থেকে ২১ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য পটুয়াখালী জেলার উপকূলে প্রচুর পরিমাণে চিংড়ির পোনা ধরা হয় এবং তা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠান হয়।

শুঁটকি : এই জেলার মূল ভূ-খণ্ডে, চর ও দ্বীপ অঞ্চলে শুঁটকি তৈরি হয়। কলাপাড়া, রাঙ্গাবালী, চরতাপসি, বড় বাইসদা, ছোট বাইসদা, চর হারা, কলাকাচিয়া, চর কাশেম রাবনাবাদ ও কুয়াকাটায় চিংড়ি, চান্দা, রূপচান্দা, ছুড়ি, লাক্ষা, লইট্যা মাছের শুঁটকি বেশি হয়। সাধারণত বাঁশের মাচার উপর ও পাটি বিছিয়ে শুঁটকি তৈরি করা হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও এন.জি.ও'র সচেতনতামূলক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক জেলে পরিবার আধুনিক পদ্ধতিতে শুঁটকি তৈরি শুরু করেছে।

দুর্যোগ

পটুয়াখালী জেলা সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের দিক দিয়ে দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। জেলার অন্যান্য দুর্যোগের মধ্যে ভরা জোয়ার, মাটি ও পানির লবণাক্ততা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

সাইক্লোন : জেলার অন্যতম প্রধান দুর্যোগ সাইক্লোন। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই জেলায় প্রায় ১৭ টি সাইক্লোন আঘাত হানে (৪ মিটার থেকে ৯ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন জলোচ্ছ্বাসসহ)। এই সাইক্লোনে প্রতি ঘন্টায় ৫০ থেকে ২৯৫ কি.মি. বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়। পটুয়াখালী জেলায় গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সাইক্লোন দুটির একটি আঘাত হানে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে এবং অপরটি ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে। এ ছাড়াও ১৯৯৪ সালের ২৯ এপ্রিল এবং ৩ মে এই জেলায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এতে প্রচুর বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে ও সম্পদ বিনষ্ট হয়। সাইক্লোনে জেলার উপকূলীয় এলাকা এবং মোহনার চর এলাকার মৎসজীবীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পটুয়াখালী জেলায় সাইক্লোনের পরিসংখ্যান

সাল	তারিখ	বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ (কি.মি./ঘন্টা)
১৯৭০	১২ নভেম্বর	২২৫
১৯৭৩	ডিসেম্বর	তথ্য নাই
১৯৭৫	নভেম্বর	তথ্য নাই
১৯৭৮	১-৩ অক্টোবর	৬৫
১৯৮১	১০ ডিসেম্বর	১২৫
১৯৭৩	১৪-১৫ অক্টোবর	৭৫
১৯৮৩	৫-৯ নভেম্বর	১২৫
১৯৮৫	২৪-২৫ মে	১৩০
১৯৮৬	৭-৯ নভেম্বর	৯৫
১৯৮৮	২৪-৩০ নভেম্বর	১৫০
১৯৯১	২৫-২৯ এপ্রিল	২৯৫
১৯৯১	৩১ মে-২ জুন	৭৫
১৯৯২	২০-২১ মে	৭৫
১৯৯২	১৭-২১ নভেম্বর	৪৫
১৯৯৪	২৯ এপ্রিল-৩ মে	২২৫
১৯৯৫	২১-২৫ নভেম্বর	৭৫
১৯৯৬	৭-৫ মে	৪৫

জলোচ্ছ্বাস : জলোচ্ছ্বাস পটুয়াখালী জেলায় অতি পরিচিত একটি দুর্যোগ। এতে অনেক এলাকা তলিয়ে যায় এবং লবণ পানি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। একদিকে ঘরবাড়ি, অন্যদিকে সব সম্পদ হারিয়ে বহু লোক নিঃস্ব হয়ে যায়।

ভরা জোয়ার : অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় ভরা জোয়ার দেখা দেয়। বর্ষাকালে অতি বৃষ্টির ফলে নদীর পানি ৪-৫ ফুট বৃদ্ধি পেয়ে ফসলের ক্ষেতে উঠে আসে এবং বাড়ি ঘর ডুবে যায়। এতে ফসল এবং ফলজ ও বনজ গাছপালা ধ্বংশ হয়ে যায়।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : সমুদ্রে পানির উচ্চতা দিন দিন বাড়ে সেই সাথে নদীর প্রবাহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে সাগরের জোয়ারের পানি পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উত্তরে আসার ফলে কৃষি জমির মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদীর মিঠাপানিও লবণাক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষি জমি উর্বরতা কমছে অন্যদিকে জেলায় খাবার পানি ও সেচ সংকট দেখা দেয়।

নদী ভাঙন : জেলায় নদী ভাঙনের প্রবণতা খুবই বেশি। লোহালিয়া ও পায়রা নদীর ভাঙনের ফলে দুমকি উপজেলার ভূমির আয়তন কমে আসছে। আবার জেলার পূর্বদিক থেকে বয়ে যাওয়া তেতুলিয়া নদীর ভাঙনে বেশ কটি ইউনিয়ন এবং হাট বাজার বিলীন হয়ে গেছে। এতে বাউফল উপজেলা এবং গলাচিপা উপজেলা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লেখ্য তেঁতুলিয়া নদী পানপট্টি ইউনিয়নের অধিকাংশ এলাকা গ্রাস করেছে। অনেক স্থানে বাঁধ ভেঙে জনসাধারণের দুর্ভোগ বেড়ে চলেছে। কলাপাড়া, গলাচিপা ও দুমকী উপজেলায় এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। তেঁতুলিয়া, আগুনমু, কাজল নদী ও রাব্‌নাবাদ চ্যানেলে ভাঙনের সমস্যা খুবই প্রকট। নদীগুলোর মোহনায় নতুন চর জেগে উঠার কারণে নদীগুলোতে ভাঙন বাড়ছে।

সমুদ্র সৈকতে ভাঙন : কুয়াকাটার ঐতিহ্য সমুদ্র সৈকত, প্রতিনিয়ত ঢেউয়ের তোড়ে ক্রমশ ভেঙ্গে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরের টানা ভাঙ্গনে সমুদ্র তটের অনেক খানি সাগরে হারিয়ে গেছে। এতে বাঁধ, নারিকেল বাগান, বন

বিভাগের বাগানসহ অনেক কিছু সাগরে গেছে। কুয়াকাটার পশ্চিম অংশে পুরাতন বেড়ি বাঁধ ভেঙ্গে প্রায় ১০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভাঙ্গনের আশংকার মধ্যে রয়েছে আরো শ-খানেক পরিবার। ভাঙ্গনের গতি ঠেকাতে না পারলে কুয়াকাটার অস্তিত্বই এক সময় মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। একই ভাবে সাগর ও নদীর ঢেউয়ে মোহনার চরগুলো ভেঙ্গে নদী সাগরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

নদী ভরাট : জেলার নদীগুলো একদিকে ভাঙ্গে আর একদিকে গড়ে। নদী ভরাটের ফলে অনেক খাল বা ছোট নদীর প্রবাহ কমে যাচ্ছে এবং নৌ চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। উল্লেখ্য তেঁতুলিয়ার অন্যতম শাখা লাউকাঠী নদীতে চর পড়ায় এর নাব্যতা রক্ষার জন্য সংস্কার করা হচ্ছে।

বন উজার : এই জেলা একসময় সুন্দরবনের অংশ ছিল। যার প্রমাণ এখনো রয়েছে নদীর পাড়ে, পতিত জমিতে। এইসব জায়গায় যে ধরনের গাছ-পালা দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে নলবন, কেওরাবন, ছৈলাবন, হোগলাপাতা, গোলপাতা ইত্যাদি। এসব প্রাকৃতিক সম্পদ দিন দিন উজাড় হওয়ার ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ। যেমন নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা এবং জমির উর্বরতা হ্রাস ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে কমে যাচ্ছে মাছ, পশু-পাখির আশ্রয় স্থান।

বিপদাপন্নতা

সীমিত সম্পদ বা জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থের অভাব ইত্যাদি ক্ষুদ্র কৃষক দলের প্রধান কয়টি বিপদাপন্নতা । জেলেদের দৈন্যদশার কারণ হল দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জলদস্যু, জেলেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, অর্থাভাব, মহাজনী বা দাদন ব্যবসা ইত্যাদি। গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে কাজের অভাব, মজুরি শোষণ, ভগ্ন বা রুগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব, আয়ের উৎস কমে যাওয়া ইত্যাদি। বসবাসের জায়গার অভাব, কাজের অভাব, জলাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শহরের দিনমজুর বা শ্রমিকদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে।

ক্ষুদ্র কৃষক	**সীমিত সম্পদ বা জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থের অভাব**
জেলে	**দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জলদস্যু, জেলেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, অর্থাভাব, মহাজনী বা দাদন ব্যবসা**
গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক	**কাজের অভাব, মজুরি শোষণ, ভগ্ন বা রুগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব, আয়ের উৎস কমে যাওয়া**
শহরে মজুরি শ্রমিক	**বসবাসের জায়গার অভাবসহ কাজের অভাব, জলাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা**

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

পটুয়াখালী জেলার মোট জনসংখ্যা ১৪.৬৪ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৭.৪ লাখ এবং নারী ৭.২ লাখ । মোট জনসংখ্যার ৯২% গ্রামে বসবাস করে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪৫৫ জন লোক বাস করে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৭৪৩ জন/ বর্গ কি. মি. (বি.বি.এস. ২০০৩)।

মোট জনসংখ্যা (লাখ)	১৪.৬৪
পুরুষ	৭.৪
নারী	৭.২
শহুরে জনসংখ্যা (লাখ)	১.২
পুরুষ	০.৬৫
নারী	০.৫৮
জনসংখার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	৪৫৫
নবজাতক মৃত্যুর হার	৫৬

জেলায় ০-১৪ ও ৬০ বছর$^{+}$ বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতা অনুপাত ০.৮৯। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৬ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৭ (বিবিএস-ইউনিসেফ ২০০১)

নৃ-গোষ্ঠী : পটুয়াখালী জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.১০% নৃ-গোষ্ঠী। কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটার তারাকালা চানপুর ও কেরানীপাড়ায় রাখাইন সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। এখানে রাখাইনদের মোট ২৫১টি পরিবার রয়েছে, যাদের মোট সংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন।

নৃ-গোষ্ঠী	
মোট জন সংখ্যা	১৫০০ জন
গৃহস্থালি	২৫১টি
জেলার মোট জন সংখ্যার %	১.১০%

ঘর-গৃহস্থালি : জেলায় গৃহস্থালির ধরনে ভিন্নতা আছে। শহুরে (০.২৪ লাখ) ও গ্রামীণ (২.৫৬ লাখ) মিলিয়ে পটুয়াখালীর মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ২.৮ লাখ। প্রতিটি গৃহস্থালির গড় জনসংখ্যা ৫.২ জন (বিবিএস ২০০১)। ১৯৯১ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যে, পটুয়াখালী জেলার মোট ঘরের ৬০.২৮% ছন, বাঁশ, পাটকাঠী ও পলিথিন দিয়ে তৈরি ও ৩৯.০৬% ঘর ঢেউটিন বা টালীর তৈরি এবং ০.৬৫% সিমেন্টের ছাদ। আবার এসব ঘরের মধ্যে ৬৩.৩০% বেড়া পাটকাঠির, বাঁশের ০.৬৮% মাটি ও দেশীয় ইটের এবং ২৫.৬৪% বেড়া টিনের, ৯.২২% ঘরের বেড়া কাঠের এবং ১.১৬% ঘরের দেয়াল পাকা।

মোট গৃহস্থালির সংখ্যা (লাখ)	২.৮
শহরে	০.২৪
গ্রামীণ	২.৫৬
গৃহ প্রতি গড় জনসংখ্যা (জন)	৫.২০
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির %)	১.৮৭%

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ১টি সরকারি জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫টি, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১২টি, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৩১টি, মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র ১টি, টিবি ক্লিনিক ১টি, শিশু হাসপাতাল ১টি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ১টি, পরিবার পরিকল্পনা সেবা কেন্দ্র ১টি ও ১টি চক্ষু হাসপাতাল (সঙ্কলন পটুয়াখালী জেলা শাখা)। এ ছাড়া দুটি বেসরকারি হাসপাতাল (ক্লিনিক) রয়েছে। জেলার সরকারি হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ৩১১টি। ৪,৭১৭ জন লোকের জন্য একটি শয্যা রয়েছে। জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেপটিক আলসার, আমাশয় ও টাইফয়েড ইত্যাদি। উল্লেখ্য, পটুয়াখালী জেলার ৭৯% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আছে।

শিশুস্বাস্থ্য : জেলায় ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৭% শিশুই অপুষ্টির শিকার। এই জেলার ৫ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৭। এই পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে হাম, ডিপিটি, পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৬২%, ৬১%, ৮৪% শিশু। এ ছাড়া ৪২% ORT নিয়েছে (বিবিএস-ইউনিসেফ ২০০১)।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : জেলার মোট ২৩% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৭০% ঘরে কাঁচা পায়খানা রয়েছে এবং ৭% ঘরে কোন রকম পায়খানা নেই। শহরে এবং গ্রামের পয়ঃসুবিধার পার্থক্য স্পষ্ট। শহরে ৭৪% পাকা, ২৪% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে, ২% কোন পায়খানা ব্যবহার করে না। গ্রাম এলাকায় ১৯% পাকা, ৭৪% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে, ৭% কোন পায়খানা ব্যবহার করে না।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৯২% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে; বাকি ৮% পানি অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। পটুয়াখালীর বেশিরভাগ উপজেলায়ই আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা প্রতি লিটারে মাত্র ৩ মাইক্রোগ্রাম।

শিক্ষা

জেলায় সাক্ষরতা হার (৭ বছর$^{+}$ বয়সী) ৫২%। প্রাপ্ত বয়স্ক (১৫ বছর$^{+}$ বয়সী) সাক্ষরতার হার ৫৪%, যার মধ্যে পুরুষ ৬০% এবং নারী ৪৯% ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে তথ্য অনুযায়ী জেলায় প্রাথমিক স্কুল রয়েছে মোট ১,৫৯৪টি। এর মধ্যে সরকারি ৫৮২টি এবং বাকি বেসরকারি ও অন্যান্য স্কুল। মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সরকারি স্কুলে ১,০৫,৭৯১ জন এবং বেসরকারি স্কুলের ১,০৭,৭০৩ জন। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় ৮০টি স্কুল রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৩,৯৫৭ জন এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৬২৪ জন। জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল রয়েছে ২১২টি। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭৯,১৭২ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ৩,৫৪৪ জন। এ ছাড়া পটুয়াখালী জেলায় ২৫০টি বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩৮,৯৪০ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১৯,৬৭০ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ১৯,২৭০ জন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মোট ৩৪টি কলেজ রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬,৫৫৫ জন। শিক্ষক এবং শিক্ষিকা যথাক্রমে ৭৪৬ এবং ১৩১ জন।

এ ছাড়াও জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি পলিটেকনিক কলেজ, ১টি প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৩টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ১টি ভোকেশনাল, ১টি নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় একটি জেলার সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ করে বলা যায়, পটুয়াখালী জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে খুব একটা এগিয়ে নেই।

সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	৫২%
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৯২%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	২৩%
শয্যা প্রতি জনসংখ্যা	৪,৭১৭ জন

প্রধান জীবিকা দল

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, বন্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম অবনতি, ভূমিহীনতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। চাষের জমির ক্রমবিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ এবং শ্রম বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন শহরে বা বন্দরে যাচ্ছে। জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ কৃষি

শ্রমিক, শহুরে শ্রমিক ও জেলে। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের চাষাবাদ করে মানুষ সংসার চালায়। এ ছাড়া জেলায় বহু লোকও শুঁটকি তৈরির কাজে নিয়োজিত।

কৃষক : পটুয়াখালী জেলায় মোট ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমান ০.০৫-২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১,৩২,৫১৮ (৫৪.৫%); মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০-৭.৪৯ একর) ৪১,৭৬১ (১৭.২%)টি পরিবার এবং বড় কৃষক (৭.৫০$^{+}$ একর) পরিবারের সংখ্যা মোট ৯,৭৪৫ (৪%)টি।

জেলে : এই জেলায় বহু সমুদ্রগামী জেলে রয়েছে। এরা সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রমের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে থাকে। গ্রীষ্ম আসার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক মাছ ধরতে সমুদ্রে যায়। এরা বছরের মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরে। আবার অনেক পরিবার অভ্যন্তরীণ নদী-নালা, খালে সারা বছর মাছ ধরে।

জেলার ৩২,০০০টি জেলে পরিবার রয়েছে এর মধ্যে ১৬,০০০টি ক্ষুদ্র জেলে পরিবার, ১২,০০০টি মাঝারি জেলে পরিবার এবং ৪,০০০টি বড় জেলে পরিবার। জেলার গ্রামীণ পরিবারগুলোর মধ্যে ১৭% পরিবার মাছ ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট।

পটুয়াখালী জেলার নদী ও সমুদ্র সৈকত ঘিরে বিরাট মৎস্য শ্রম বাজার গড়ে উঠেছে। ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ সাগর, নদী, খালে মাছ ধরা, মাছ বিক্রি, চিংড়ি পোনা আহরণসহ বিভিন্ন কাজে শ্রম দিচ্ছে। এদের মধ্যে যারা চিংড়ির পোনা আহরণ করে এবং অন্যান্য কাজ করে এর বিরাট একটি অংশ শিশু শ্রমিক।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে, আবার পরিবার বিভাজনের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকে। জেলার মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ৭৪,৩৬০টি যা মোট পরিবারের ৩১%।

শহুরে শ্রমিক : বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত পটুয়াখালী শহরেও শ্রমিক সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গ্রাম এলাকায় যথাযথ আয়ের উৎসের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীন মানুষ শহরে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এরা কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, পরিবহন শ্রমিক যোগালী হিসাবে কাজ করে। উল্লেখ্য, জেলায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা কম। একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন অন্যদিকে শিক্ষার হার বেশি থাকার ফলে শহরে গিয়ে এরা পোশাক শিল্পে ও বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মাথাপিছু আয়	১৮,১৩৭ টাকা
মোট শিল্পে আয়	১২%
স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৫.৩%
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন খানা	১৪%

জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ- এই সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। ১৯৯৯/২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পটুয়াখালীতে সক্রিয় শ্রম জনশক্তির সংখা ৯৩৭ হাজার। এর মধ্যে ৬৪% পুরুষ এবং ৩৬% নারী। বিগত ১৯৯৫/৯৬ সালে জনশক্তি ছিল ৭৬২ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ৫৮%, ৪২% (বিবিএস-২০০০)। বর্তমানে জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৮১৩৭ টাকা। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.১১ হেক্টর এবং জেলায় প্রথম শ্রেণীর ০.০১ হে. কৃষি জমির মূল্য পাঁচ হাজার ছয় শত টাকা (সূত্র : বাংলা পিডিয়া, মার্চ ২০০৩)।

দরিদ্র	৪৬%
অতি দরিদ্র	১৪%
ভূমিহীন	৫৬.৩%
ক্ষুদ্র কৃষক	৫৪.৫%

দারিদ্র্য : পটুয়াখালী জেলার অধিকাংশ লোক কৃষিনির্ভর। তাই যখনই কোন দুর্যোগ আসে তখন এসব ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকরা পরে যায় দুরবস্থায়। আর এই ক্ষতির পরিমাণ ২-৩ বছরে কাটিয়ে উঠতে পারে না। এ ছাড়াও নদী ভাঙনের ফলে

ধীরে ধীরে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। জেলায় মাথাপিছু আয় (১৮১৩৭) জাতীয় আয়ের (১৮,২৬৯) চেয়ে কম। পটুয়াখালী জেলার মোট জনসংখ্যার ৪৬% দরিদ্র এবং ১৪% অতি দরিদ্র (বিবিএস/ইউনিসেফ)। এ ছাড়া জেলার মোট ৫৬.৩% ভূমিহীন এবং ৫৪.৫% ক্ষুদ্র কৃষক (বিবিএস-১৯৯৬)।

নারীদের অবস্থান

- জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৩
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৯৭, যা জাতীয় (৯০) হারের তুলনায় বেশি।
- নারীর সাক্ষরতার হার (৭ বছর +) ৪৮% এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার ৪৯%, যা জাতীয় হারের (৪১%) তুলনায় অনেক বেশি।
- মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার ৯৯% জাতীয় হারের তুলনায় বেশি।
- জেলায় কার্যক্ষম নারী জনশক্তি (৩৬%) জাতীয় হারের (৩৭%) চেয়ে কম।
- জেলায় নারীদের কর্ম সুযোগ কম।

অতি সম্প্রতি, সিপিডি-ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায়, পটুয়াখালী জেলা "মাঝারি মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য এই সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লিঙ্গ অনুপাত : পটুয়াখালীর মোট জনসংখ্যার ৪৯.৩৩% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৩, যা নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা। অপ্রাপ্তবয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৭ । আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:৯৪ (বি.বি.এস, ২০০১)। জেলার নারীদের প্রজনন হার ২.০৯ (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ২টি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৬ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি। জেলার মাতৃ মৃত্যুর হার নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার অভাব যেমন ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে।

বৈবাহিক অবস্থান : ৩২% নারী বিবাহিত এবং ৪% নারী তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস, ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৭১% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাঁধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিও-দের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

সক্রিয় শ্রমশক্তি : পটুয়াখালীর নারীদের মধ্যে সক্রিয় শ্রমশক্তির হার ক্রমশ কমছে। গত ১৯৯৫-৯৬ সালে সক্রিয় শ্রমশক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনগণের ৪২% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে কমে গিয়ে হয় ৩৬%। এই ৩৬% নারী শ্রমশক্তির মধ্যে ২০% শহরের এবং ৩৭% গ্রামের। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, তারা সেই চিরায়ত পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২.৮১% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয় (বি.বি.এস, ১৯৯৬)।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : পটুয়াখালীর নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা নারীর স্বাস্থ্য সার্বিকভাবে দুর্বল করেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ১০%, যা জাতীয় হারের তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৮% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ৮১% ক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন, মাত্র ২৪% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান এবং আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ২% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শিক্ষা : জেলার ৭ বছর$^{+}$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৮% যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের মধ্যে ৪৯%। পটুয়াখালী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ৯৯ এবং মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫০% ছাত্রী। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। মাধ্যমিক স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীদের ৪৬% ছাত্রী এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীদের ৪৯% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম, ৪২.৩৫% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে।

অবকাঠামো

ভৌত অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট : পটুয়াখালী জেলায় ২২৭৯ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ৩৮ কি.মি. জাতীয় মহা সড়ক, ৩০ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক, ২১১ কি.মি. ফিডার রোড এ, ১৫১ কি.মি. ফিডার রোড বি, এবং ৬০৭ কি.মি গ্রামীণ - ১, ও ১,২৪২ কি.মি. গ্রামীণ -২ ধরনের রাস্তা রয়েছে। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাস্তা-ঘাটের অবস্থা ততটা ভাল নয়। তাই উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা কঠিন হচ্ছে।

নৌ-পথ : জেলার বেশিরভাগ পণ্য পরিবহন ও যাতায়াতের মাধ্যম নৌ-পথ। জেলার অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে নদীপথ ছাড়া উপায় নেই। তাই বেশিরভাগ লোক নৌপথ ব্যবহার করে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচলের জন্য জেলায় বেশ কয়েকটি নদী বন্দর গড়ে উঠেছে। এই বন্দরগুলোতে আভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচল করা স্টীমার, বড় লঞ্চ, ছোট লঞ্চ এবং যন্ত্রচালিত নৌকায় লোক এবং মালামাল উঠানামা করে।

পোল্ডার/বাঁধ : সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভরা জোয়ারের মত বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে বিগত ষাটের দশকে বাংলাদেশে পোল্ডার বা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেশ কয়েকটি পোল্ডার রয়েছে। এই সব পোল্ডারের আওতায় ১০৭৫ কি.মি. বাঁধ, ১৩৮টি রেগুলেটর, ৩৭৯টি ফ্লাশিং ইনলেটস্ ও ১২৩৮টি নিষ্কাশন খাল রয়েছে।

এসব বাঁধ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করা প্রয়োজন, কিন্তু এর কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এলাকাবাসীর অসচেতনতা, রক্ষনাবেক্ষণে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য-সহযোগিতার অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারনে বাধঁ দুর্বল হয়ে অনেক সময় ভেঙ্গে যায়। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মত বিপর্যয়ের সময় বাধঁ ভেঙ্গে সমুদ্রের পানি প্রবেশ করে ফসলহানিসহ অন্যান্য সম্পদ নষ্ট হয় এবং প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র : জেলায় মোট ১৯৬টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে (এল.জি.ই.ডি, ২০০৪)। এই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে জেলার মোট ২৭% লোক আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা দেয়, খাদ্যগুদাম হিসেবে ব্যবহার হয় এবং অন্য সময় স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

হাট-বাজার ও বন্দর : রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা, ভোগ্যপণ্য বিস্তারের কারণে জেলায় হাটবাজার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জেলায় ১৯৫ টি হাট-বাজার রয়েছে।

উল্লেখ্য, নদী বন্দরগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বড় হাট-বাজার ও মোকাম। এসব বন্দরের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়লে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই জেলায় বাসস্ট্যাণ্ড রয়েছে এবং প্রতিদিন দূরপাল্লার বাস চলাচল করে।

বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ : পটুয়াখালী জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘরের সংখ্যা ৩৯,৩৬০, যা মোট ঘরের ১৪%। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৫৩% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ১০%। এই হার নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে

জেলার মাত্র ৩% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল (বা.প.ব্যু. ১৯৯৪, ২০০১)। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও পটুয়াখালী স্টেশন থেকে সমগ্র জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় পটুয়াখালী স্টেশন থেকে জেলায় মোট ৪,৪০৩ বর্গ কি.মি. এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ১,৩৯৮টি (বা.প.ব্যু. ১৯৯৮)।

শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ	৫৩%
গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগ	১০%
পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ	৪,৪০৩ বর্গ কি.মি.

সেচ ও গুদাম : জেলার কৃষিজীবীরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এই জেলায় ১৯৪ এল.এল.পি. দিয়ে ১৩৪৯ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হয়। জেলায় ২০টি খাদ্যগুদাম রয়েছে। এই গুদামগুলোর মোট ধারণক্ষমতা ২৯১৪০ মে.টন। এছাড়াও ৩টি বীজ গুদাম (মোট ধারণ ক্ষমতা ৯০০ মে.টন) এবং ৩টি সার গুদাম (মোট ধারণক্ষমতা ৩৮০০ মে.টন) রয়েছে।

খাদ্য গুদাম	২০ টি
বীজ গুদাম	৩ টি
সার গুদাম	৩ টি

হোটেল/অবকাশ কেন্দ্র : জেলা সদরে একটি সার্কিট হাউজ ও একটি ডাকবাংলো রয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডাকবাংলো রয়েছে। এ ছাড়া কুয়াকাটায় একটি পর্যটন মোটেল ও ছোট-বড় প্রায় ২০টি আবাসিক হোটেল রয়েছে।

শিল্প

এই জেলায় প্রচুর নদী-নালা ও খাল থাকায় এবং অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে এই জেলায় ১টি পাট কল, ১টি বস্ত্র কল, ২৪৬টি চাল কল, ১১২টি আটার কল ও ৪টি ময়দার কল রয়েছে। জেলায় প্রচুর মৎস্য সম্পদ থাকায় বর্তমানে ১৮টি বরফ কল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও ১২টি তেলের কল, ১টি ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ১৬টি ছাপাখানা, ৩২টি আইসক্রিম ফ্যাক্টরি ও অন্যান্য ৫৭৭৮টি কুটির শিল্প রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে জেলায় সরকারি ১০টি সংস্থার মোট ২৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এখানে যে সকল প্রকল্প ২০০৪ সালের জুন মাসের পরেও চলমান সেগুলোর হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। যে সব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সে গুলো হচ্ছে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পশু সম্পদ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোড ও পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৫
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪
মৎস্য বিভাগ	২
কৃষি উন্নয়ন অধিদপ্তর	১
পশু সম্পদ অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	৩
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

এ সকল প্রকল্পে যে সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহযোগিতা করছে সেগুলো হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, নেদারল্যান্ডস সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফ ইত্যাদি।

পটুয়াখালী জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও-র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রয়েছে। বড় এনজিওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, কেয়ার-বাংলাদেশ, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক -এর নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া স্থানীয় এনজিও দের মধ্যে MCC, PMUS, CODEC, SSDP - এর কথা বলা যায়, যারা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে।

প্রধান প্রধান জাতীয় এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলার মোট ২৩% গৃহস্থ। গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ ৭,৪৭৫ টাকা মাত্র (পিডিও-আইসিজেডএমপি, ২০০৩)। এ ছাড়া জেলার দুঃস্থদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কাজ করছে।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ডের বিবরন

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গৃহস্থ (জন)	৬৬,৩৭৯
% গৃহস্থ (মোট)	২৩%
মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	৪৯.৬২
গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ (টাকা)	৭,৪৭৫

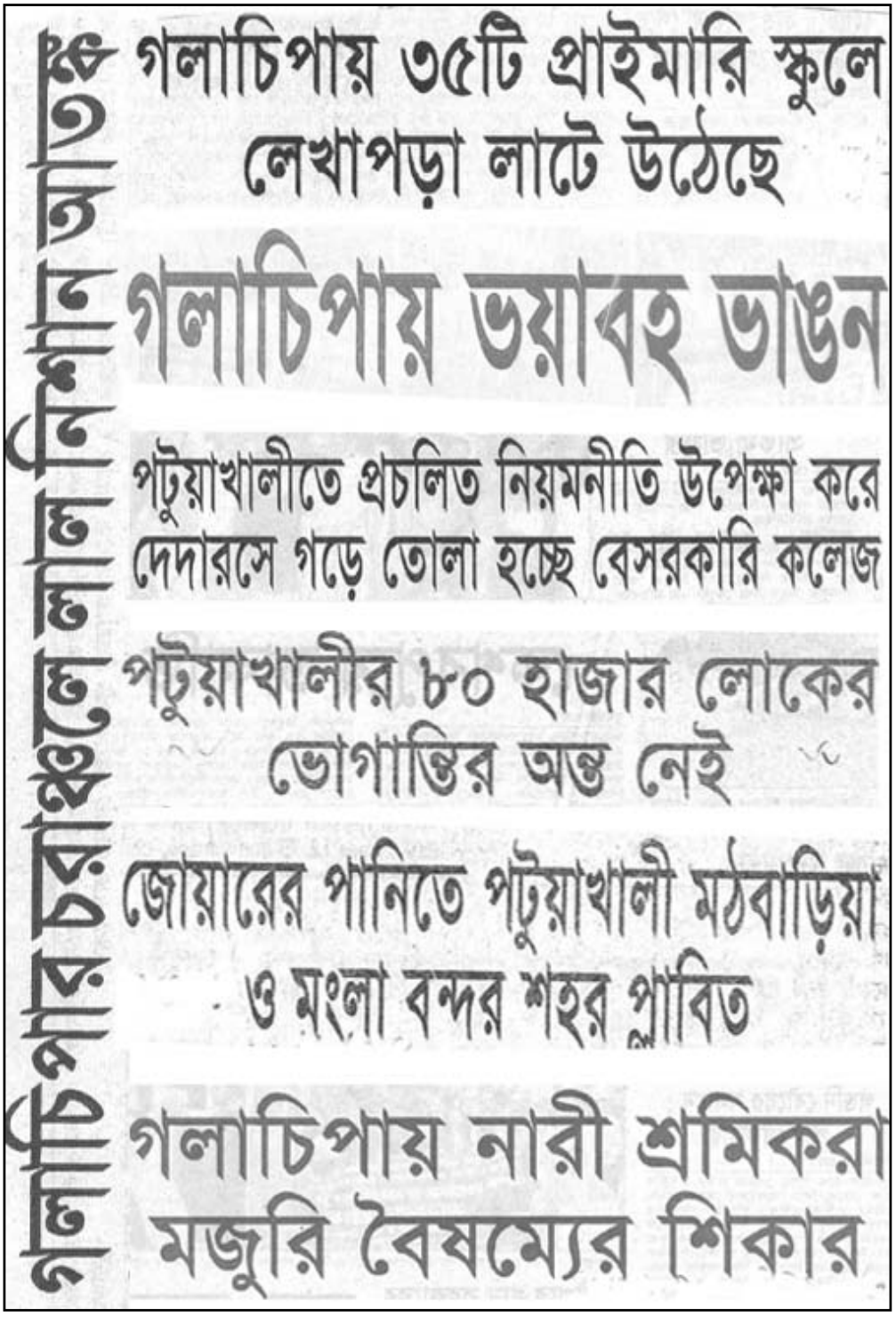
গলাচিপায় ৩৫টি প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া লাটে উঠেছে
গলাচিপায় ভয়াবহ ভাঙন
পটুয়াখালীতে প্রচলিত নিয়মনীতি উপেক্ষা করে দেদারসে গড়ে তোলা হচ্ছে বেসরকারি কলেজ
পটুয়াখালীর ৮০ হাজার লোকের ভোগান্তির অন্ত নেই
জোয়ারের পানিতে পটুয়াখালী মঠবাড়িয়া ও মংলা বন্দর শহর প্লাবিত
গলাচিপায় নারী শ্রমিকরা মজুরি বৈষম্যের শিকার
গলাচিপার চরাঞ্চলে লাল নিশান আতঙ্ক

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

পটুয়াখালী জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং মানুষের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল।

পরিবেশগত সমস্যা

পরিবেশগত সমস্যা
- সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস
- ভরা জোয়ার
- জলাবদ্ধতা
- জলবায়ুর পরিবর্তন
- জীব বৈচিত্র্য হ্রাস
- মাটি ও পানির লবণাক্ততা
- পরিবেশ দুষন

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- কুটির শিল্প
- অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

কৃষি বিষয়ক সমস্যা
- পঙ্গপালের (পামুরি) আক্রমণ
- বাজারজাতকরন বা সংরক্ষণের অভাব
- মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা
- খাল বিল সংরক্ষণ ও সংস্কার

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস : সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে বিপন্ন হয়ে পড়ে মানুষের জীবন ও সম্পদ। জেলায় আপদকালীন নিরাপত্তার অভাব ও অপর্যাপ্ত সতর্ক সংকেত জেলার মানুষ ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে। এতে বাঁধ বা পোল্ডারগুলো ভেঙ্গে যায় এবং লবণ পানিতে ফসলের ক্ষেত ধ্বংস হয়। উল্লেখ্য পটুয়াখালী জেলায় জনসাধারণ ও তাদের সম্পদ নিরাপদ স্থানে নেয়ার ব্যবস্থাও অপ্রতুল। চর ও দ্বীপের লোকদের পরিবহনের অভাব ও সচেতনতার অভাব আরো বিপর্যয় ডেকে আনে।

ভরা জোয়ার : অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় সমুদ্র উত্তাল হলে ভরা জোয়ার সৃষ্টি হয়। এতে জেলার চর ও দ্বীপগুলো ৩-৪ ফুট পানিতে প্লাবিত হয়। ফলে ফসল ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি হয়।

জলাবদ্ধতা : জেলায় গ্রামগঞ্জের ছোট ছোট খালগুলোর মুখ পলি পড়ে জমির চেয়ে উঁচু হয়ে গিয়েছে। যার ফলে ভরা জোয়ারে পানি সহজে সরতে চায় না। আবার অতিবৃষ্টি হলেও জমিতে পানি জমে ফসলের ক্ষতি করে। উল্লেখ্য গ্রামে অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ করার ফলেও জলাবদ্ধতা ক্রমশ বাড়ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনাকাংক্ষিত এই জলবায়ুর পরিবর্তন একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে "আয়ের নিরাপত্তাহীনতা"কে তীব্রতর করে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি নারী মজুরি শ্রমিক ও গৃহিণীদের "সম্পদ ও নিরাপত্তা"কে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

জীব বৈচিত্র্য হ্রাস : এই জেলার কিছু মাছ ছিল যা মিঠাপানি এবং লবণ পানি দুই-এর মধ্যে পাওয়া যেত। যেমন- তাপসী, পোয়া, গুলসা ট্যাংরা, চাপিলা, ইলিশ ইত্যাদি। এসব মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক আবাস স্থলের অভাবে বহু জীব প্রজাতি এখন লুপ্ত প্রায়।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : নদীপ্রবাহ কমে যাওয়া, নদীর ভাঙন, নদীর তলদেশ ভরাট এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানি নদীর অনেক উজানে এবং জমিতেও প্রবেশ করছে। ফলে জমি তার উর্বরতা হারাচ্ছে খুবই দ্রুতহারে। নদীতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ : জেলায় চিংড়ি ঘের ও বর্জ্য, রাসায়নিক সার, শহরের বর্জ্য দিন দিন পরিবেশকে দূষিত করছে। ইদানীং গভীর সমুদ্রে বিদেশী জাহাজ থেকে বর্জ্যপদার্থ ফেলা হচ্ছে। ফলে সমুদ্র এবং উপকূলীয় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

কুটির শিল্প : জেলায় বেশ কিছু কুটির শিল্প রয়েছে যেমন, মৃৎ শিল্প, পাপোষ, কাঠের তৈরি তৈজসপত্র, কামার, স্বর্ণকার এরা বেশিরভাগই দিন দিন অর্থের অভাব এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে পেশা পরিবর্তন করছে।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কৃষকরা তাদের ফসল বাজারজাত করতে পারে না। অন্য জেলা থেকে ফসল এবং কাঁচামাল আনা-নেয়া করায় প্রচুর সময় নষ্ট হয়। রাজধানীসহ অন্যান্য শহরের সাথে যোগাযোগের জন্য মাত্র একটি পাকা রাস্তা রয়েছে। এ ছাড়া জেলার নৌপরিবহন ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন দরকার। বিশেষ করে গ্রামে, গঞ্জে, বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দরকার। সেই সাথে জেলার একটা বিরাট অংশ নৌপথ। এই নৌপথও নিরাপদ করা একান্ত প্রয়োজন।

কৃষি বিষয়ক সমস্যা

পটুয়াখালী জেলার কৃষি ব্যবস্থা সনাতনী পদ্ধতির। জেলায় কৃষকদের প্রতি বছর উন্নতজাতের বীজ সরবরাহের অভাব রয়েছে। ফসল রক্ষাকারী বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও মিঠা পানি সংরক্ষণের অভাবে কৃষিকাজ ব্যাহত হয়। এখানে কৃষকরা কৃষি তথ্য ও সুপরামর্শ থেকে বঞ্চিত। তাই শস্য ও ফলজ কৃষির ফলন কম হচ্ছে।

পঙ্গপালের (পামুরি) আক্রমণ : পঙ্গপালের বা পামুরি পোকার আক্রমণে প্রায় প্রতি বছরই ফসল (রোপা আমন, আউশ, বোরো ধান) ধ্বংস হয়। কৃষকরা চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে।

বাজারজাতকরন বা সংরক্ষণের অভাব : বাজারজাতকরন বা সংরক্ষণের অভাবে ফলজ কৃষি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা হতাশ হয়ে পড়ছে। এছাড়া মধ্যস্বত্বভুগীদের কারণে কৃষকরা তাদের প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেননা প্রকৃত মূল্যের এক বিরাট অংশ এই ফড়িয়া বা আড়তদাররা নিয়ে নেয়।

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা : এ জেলায় বেশ কয়েকটি স্থানে সামুদ্রিক মাছের বড় বড় পাইকারি বাজার ও আড়ত রয়েছে। যেমন - চরমন্তাজ, রাঙ্গাবালী, বাইশদিয়া, কুয়াকাটা, সোনাচর ও মহিপুর (আলীপুর)। এসব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলো অবকাঠামোর দিক থেকে সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে জেলেরা মাছের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খাল বিল সংরক্ষণ ও সংস্কার : জেলায় প্রচুর খাল-বিল-নালা রয়েছে। এইসব খাল-বিল-নালায় জোয়ারের জন্য প্রতিনিয়ত পলি জমে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে বেশি পলি জমে। এই পলির ফলে খাল-বিল-নালাগুলোর সাথে নদীর সংযোগস্থল উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ফলে ফসলি জমির পানি নদীতে নামতে পারে না এবং ফসল নষ্ট করে ফেলে। তাই খাল ও নালাগুলো সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

পটুয়াখালী জেলার "কুয়াকাটা" বাংলাদেশের একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। "কুয়াকাটা" সৈকতে পর্যাপ্ত মোটেল, হোটেল, রেস্টুরেন্ট-এর অভাব রয়েছে। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। পর্যটন শিল্পের জন্য যোগাযোগ

ব্যবস্থা আধুনিক করা প্রয়োজন। সর্বোপরি পর্যটন এলাকা গড়ে উঠার জন্য প্রধান দরকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার, সেটির অভাব রয়েছে কুয়াকাটায়।

পটুয়াখালী সমুদ্র সৈকত রাখাইন সম্প্রদায়ের আবাসভূমি। আর এই রাখাইন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কিন্তু এই রাখাইন সম্প্রদায় সামাজিক বিভিন্ন কারণে দেশের অন্যত্র স্থায়ীভাবে চলে যাচ্ছে।

দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ

গলাচিপায় ৪৪৮ ছিন্নমূল পরিবারের মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলেছে

Bumper vegetable output likely in Patuakhali

রাস উৎসব : কুয়াকাটায় মানুষের ঢল দুবলার চরে পুণ্যস্নানের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত

Batik fashions from remote village

কুয়াকাটা রক্ষায় প্রকল্প গ্রহণ

গলাচিপায় ধান কাটা শুরু

Free soil test for farmers

কুয়াকাটায় তরমুজ চাষে নীরব বিপ্লব

সম্ভাবনা ও সুযোগ

কৃষি, মৎস্য সম্পদ ও পর্যটন বিপুল সম্ভাবনাময় জেলা পটুয়াখালী। জেলা ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জনমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কৃষি ও অর্থনীতি

ধান : পটুয়াখালী জেলার মূল ফসল ধান। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিসহ কৃষকদের উন্নতমানের স্থানীয় ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ সরবরাহ ফসল সংরক্ষণের সুব্যবস্থা এবং প্রকৃত মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

রবিশস্য : এই জেলার চর এলাকায় প্রচুর রবিশস্যের চাষ হয়। বিভিন্ন রকমের ডাল, তৈলবীজ, আলু, শাক-সবজি, মরিচ ইত্যাদি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা, সঠিক বাজার মূল্য থেকে চাষীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হয়।

কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প : এখানে কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা প্রচুর। যেমন নারিকেলের ছোবরা থেকে তৈরি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র কাঠ শিল্প, মৃৎশিল্প, কামার ইত্যাদি। এ ছাড়াও এই জেলায় বেশ কয়েকটি মৌসুমী ফল জন্মায়, যেমন, পেয়ারা ও আমড়া। এই দুটি ফল টিনজাত করে দেশে এবং বিদেশে বাজারজাত করা যায়।

সুযোগ ও সম্ভাবনা

কৃষি ও অর্থনীতি
- ধান
- রবিশস্য
- কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প
- চিংড়ি চাষ
- শুঁটকি
- ভূমি ব্যবহার

পর্যটন শিল্প

শিল্প ও বাণিজ্য
- শিল্প
- ব্যক্তি খাত

প্রাকৃতিক সম্পদ
- বনজ সম্পদ
- মৎস্য সম্পদ

গণমাধ্যমের উন্নয়ন

চিংড়ি চাষ : পটুয়াখালীতে চিংড়ি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। এই জেলা থেকে চিংড়ির পোনা দেশের বিভিন্ন এলাকায় যায়। এই চিংড়ির পোনা ধরাকে কেন্দ্র করে পটুয়াখালী উপকূলে একটি বড় ধরনের পোনা ধরার শ্রমবাজার এবং কেনাবেচার বাজার গড়ে উঠেছে। ফলে চিংড়ির পোনা জেলায় সহজলভ্য। এই জেলায় চিংড়ি চাষের উপযুক্ত স্থানগুলোতে পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ করা সম্ভব এবং এতে করে চিংড়ি চাষের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। জমির যথাযথ ব্যবহার, পরিস্থিতির উন্নয়ন করে চিংড়ি চাষের সম্ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই জেলায় যদি চিংড়ি প্রক্রিয়াজতকরণ ও চিংড়িজাত খাবার তৈরি করার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয় তাহলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

শুঁটকি মাছ : পটুয়াখালী জেলার অন্যতম সম্ভাবনা শুঁটকি মাছ। চরমনতাজ, সোনাচর, ও কুয়াকাটায় সনাতন পদ্ধতিতে রোদে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করা হয়। যথাযথ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে এই জেলায় শুঁটকি শিল্পের প্রসার ঘটানো সম্ভব।

ভূমি ব্যবহার : স্থানীয় জনগণ এবং সরকারিভাবে যৌথ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি থাকলে চাষাবাদে সুবিধা হয়। কারণ পরিকল্পনামাফিক জমি ব্যবহার করলে জমির সম্পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সেই সাথে জমির উর্বরতাও রক্ষা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য : জেলায় কৃষিনির্ভরতার কারণে কৃষি বনজ ও ফলজ বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠা সম্ভব। তাই জেলায় বেশ কিছু বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ঐসব কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক করা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন গোডাউন, বিদ্যুতায়ন, জেটি এবং অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করলে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে এবং স্থানীয়

অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং অতিসহজে দেশের বাজারে, স্থানীয় পণ্য পৌছানো নিশ্চিত করতে পারলে এই জেলার বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

পর্যটন শিল্প

দেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। এখানে সারা বছর প্রচুর দেশী-বিদেশী পর্যটকের সমাগম ঘটে। এটি দেশের অন্যতম পর্যটন এলাকা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এখানে একই সাথে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উপভোগ করা যায়। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আর রাখাইন সমাজের বসবাস ও তাদের বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থা কুয়াকাটাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

পর্যটন শিল্পের মূল আকর্ষণ হচ্ছে উন্নতমানের থাকার ব্যবস্থা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। যাতে বিদেশী ও দেশী পর্যটকরা তাদের পছন্দমত খাবার খেতে পারে এবং থাকতে পারে। সেই সাথে যুগোপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা এবং স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে লালন-পালন করে দর্শনীয় অবস্থায় নিয়ে যেতে পারলে এই শিল্পের প্রসার ঘটবে।

সেই সাথে পর্যটকদের ও বিনিয়োগকারীর নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। একই সাথে এই পর্যটন শিল্পের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থানীয়ভাবে সমুদ্রে ও মোহনায় নৌভ্রমণের জন্য আধুনিক ও নিরাপদ নৌ-যানের ব্যবস্থা করলে এই শিল্প আরো সমৃদ্ধশালি হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্প : এই জেলায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন এই জেলায় প্রচুর জনশক্তি ও ধনী ব্যক্তি রয়েছে। সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ ও ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা বিধান করা গেলে এই জেলায় ও প্রতিটি উপজেলায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারে।

ব্যক্তি খাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তি খাতে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প এবং বেশ কিছু লবণ ফ্যাক্টরি ও বরফকল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বহু বৎসর পূর্ব থেকে চাল ভাঙ্গার কল, পাপোষ, কার্পেট, স-মিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এসব ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ আর্থিক সহযোগিতা করলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদ

বনজ সম্পদ : জেলায় বিভিন্ন উপজেলার চরে প্রাকৃতিক বন ছাড়া সরকারি সৃজিত বাগান, অশ্রেণীভুক্ত বন, গ্রামীণ বনজ বাগান মিলিয়ে বনাঞ্চলের পরিমাণ অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং এখনও নদীর তীরে নল বন ও কেওরা বন রয়েছে। যা সংরক্ষণ করলে নদীর ভাঙন কমবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সম্পদ রক্ষা পাবে।

মৎস্য সম্পদ : জেলায় রয়েছে একটি বৃহৎ মৎস্য ভাণ্ডার। যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে সমুদ্রের মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তি ও মাছ ধরার শক্তিশালী জেলে নৌকা (লঞ্চ)'র জন্য ঋণের সুবিধা পেলে জেলেরা গভীর সাগরের অফুরান মাছ ধরবে এবং অগভীর সাগরের উপর চাপ কমবে। এর ফলে মাছের পোনা রক্ষা পেয়ে গভীর সাগরের মাছ উৎপাদন বাড়বে।

গণমাধ্যমের উন্নয়ন

পটুযাখালীতে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন করা হলে এর মাধ্যমে এ জেলার মানবাধিকার পরিস্থিতি, উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ নানা বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব। রেডিওতে এসব বিষয়ে প্রচারিত হলে মানুষ ক্রমে সচেতন হবে এবং গণমাধ্যমের কল্যাণে এলাকার উন্নয়ন সাধিত হবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

	২০১৫	২০৫০
মোট লোকসংখ্যা (লাখ)	১৭.৫৫	২৪.৪৫
পুরুষ	৮.৭৯	১২.২২
নারী	৮.৭৬	১২.২২
গ্রামীণ জনসংখ্যা	১৬.৩৫	২২.৭০
শহুরে জনসংখ্যা	১.২০	১.৭৫

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর ২০১৫ সাল। এ সালে পটুয়াখালী জেলায় জনসংখ্যা ১৪.৬৪ লাখ (২০০১) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৭.৫৫ লাখ হতে পারে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানা পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগান যায় তা হল, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, চিংড়ি চাষ, উন্নতমানের হাঁস-মুরগির খামার, মাছ চাষ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। সে সাথে যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে তা হল বাণিজ্য প্রসার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও হাটবাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

পার্শ্ববর্তী জেলা যেমন বরগুনা, ঝালকাঠী ও ভোলার অংশবিশেষের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল মোকামগুলো পটুয়াখালীতে অবস্থিত। ফলে, উল্লিখিত জেলার ধান-চাল নারিকেল সুপারি কলা ও হাঁস-মুরগির পাইকারি বেচা-কেনা হয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। জেলার ঐসব বিখ্যাত হাট-বাজার, মোকামগুলোর আরো কাঠামোগত উন্নতি হওয়া দরকার। বিশেষ করে গোডাউন, রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অতি জরুরী। তাহলে এই জেলায় হাটবাজারগুলো আরো বড় আকারে বসবে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতাদের আকর্ষণ বাড়বে। এসব বিষয়ে স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো যেমন কালাইয়া, বগা, গলাচিপা, রাঙ্গাবালী, সোনাচর, কুয়াকাটা ইত্যাদি মোকামগুলোতে কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করলে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন সম্ভব।

কুয়াকাটা সৈকতের আশপাশে আরো বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে। যেমন সোনারচর, সখীনার সী-বিচ ও চরগঙ্গামতি। যথাযথ ব্যবস্থাপনার মধ্যমে এসব স্থানে উপযোগী কাঠামোগত উন্নয়ন হলে পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে।

জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হবে। একই সাথে উন্নত শিক্ষার প্রসার ঘটবে। এই জেলায় স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার উন্নয়ন হবে। এ ছাড়া জেলায় একটি আঞ্চলিক মহাসড়ক ও একটি বিমান-বন্দর রয়েছে, যার উন্নয়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। উল্লিখিত বিষয়গুলোর উন্নয়ন সঠিকভাবে শেষ হলে জেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

জেলার মৎস্য সম্পদকে ঘিরে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই মৎস্য সম্পদকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন অনুসরন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে জেলেদের মৎস্য আইন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা করতে পারলে জেলার মৎস্য সম্পদ একটি বড় অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

দর্শনীয় স্থান

কুয়াকাটা : বঙ্গোপসাগরের তীরে সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। কয়েকশ বছর পূর্ব থেকে কুয়াকাটা, হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। কার্তিকের পূর্ণিমায় তিথি পেরিয়ে সূর্য উঠলে এখানে পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকশ বছরের সেই ঐতিহ্য আজও টিকে আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এখানে সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটি ছিল ও বিমান অবতরণের জন্য একটি বিমানবন্দর তৈরি করা হয়েছিল। এখানে পর্তুগীজ আমলের তৈরি একটি কূপ আছে। জনশ্রুতি আছে, এই কূপের নামানুসারে স্থানের নাম কুয়াকাটা রাখা হয়। এখানে রয়েছে রাখাইন সম্প্রদায় এবং তাদের ধর্মীয় মন্দির বা প্যাগোডা। কুয়াকাটায় একটি বড় বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। এই কুয়াকাটার কালা চাঁদপুর ও কেরানীপাড়ায় রাখাইন সম্প্রদায়ের বসবাস বেশি। কুয়াকাটায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু থাকা-খাওয়ার হোটেল/রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য, ব্যক্তি উদ্যোগে একটি সামুদ্রিক প্রাণীর মিউজিয়ামও গড়ে উঠেছে।

মির্জাগঞ্জ মাজার : এখানে ১৯১২ সালে থানা স্থাপন করা হয়। এই মির্জাগঞ্জে হযরত ইয়ারউদ্দিন খলিফার মাজার আছে। প্রতিবছর এখানে একবার ধর্মীয় মিলাদ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও রুকনউদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৬) শাসন আমলের একটি মসজিদ আছে।

খেপুপাড়া : এক সময় সুন্দরবনের অংশ ছিল খেপুপাড়া। নীলগঞ্জ নদীর তীরে অবস্থিত একটি নৌ-বন্দর। রাখাইন সম্প্রদায় এ অঞ্চলে প্রথম আবাদ করে। তাদের নেতা খেপু রাখাইন-এর নামে খেপুপাড়া নামকরণ করা হয়।

কচুয়া : জেলার বাউফল উপজেলায় অবস্থিত। এখানে প্রাচীন চন্দ্রদীপ রাজ্যের রাজধানী ছিল। বাকলা ও কচুয়া একই স্থান। এখানে রাজবাড়ি ও সু-উচ্চ মন্দির ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. বেভারিজ এই মন্দির ও পরিত্যক্ত ভবনের কথা তার পুস্তকে লিখেছেন।

কমলারানীর দীঘি : এই দীঘি বাউফল উপজেলায় অবস্থিত। কমল রানী ১৪৯০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রজাদের পানি কষ্ট দূর করার জন্য দীঘি খনন করেন।

দয়াময়ী মন্দির : গলাচিপা উপজেলায় দয়াময়ী মন্দির অবস্থিত। রাজা শ্রী ভবানী শংকর সেন আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে বাংলা ১২০৮ সালে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও এখানে প্রতি বছর মাঘী পঞ্চমীতে মেলা হয়।

শ্রীরামপুরের মসজিদ : পটুয়াখালী শহর থেকে ৭ কি.মি. উত্তর-পূর্বে প্রায় আড়াইশ বছরের পুরানোকালের খাঁ মসজিদ। এখানে আরো রয়েছে বুরম খাঁর পুল ও আন্দারকিল্লা।

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির নির্দেশনায় এটি পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

এই প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে ছয়টি কর্মসূচিতে ভাগ করা হয়েছে-

- উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জন্য কর্মকৌশল প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
- একটি সমন্বিত জ্ঞান ভাণ্ডার

বর্তমানে প্রকল্প থেকে বহু বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনসহ উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণীত হয়েছে। উপকূল অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়নে উপকূলীয় এলাকার গণমানুষের পরামর্শ ও মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই প্রকল্প শুরুর সময় থেকে আজ অবধি সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অনেকগুলো বৈঠক, গবেষণা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাক্রমিক বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যয়ণ	**মে-জুন, ২০০২**
উপকূলীয় জেলার বিপদাপন্নতার কারণ অধ্যয়ণ	**জুলাই, ২০০৩**
খসড়া উপকূল অঞ্চল নীতির উপর জেলাপর্যায়ে মতবিনিময় সভা	**অক্টোবর, ২০০৩**

জনসাধারণের সার্বিক অবস্থা জানার লক্ষ্যে পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি এখানেই থেমে নেই। প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে চলতে থাকবে। খুব শিগগিরই প্রকল্প ও জেলাবাসীর অংশগ্রহণে অংশীদারদের আলোচনা, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।